পঞ্চম অধ্যায়

সাক্ষাৎকার

আমার এই গবেষণার কাজে যে কয়েকজন সাহিত্যিককে গ্রহণ করেছি তাঁদের মধ্যে জীবিতদের সকলের সাথে যোগাযোগ করেও শেষপর্যন্ত নানা কারণে প্রত্যেকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আমি দু-জনের (নলিনী বেরা ও রামকুমার মুখোপাধ্যায়) সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি এবং তাঁরা আমার গবেষণার নানা দিক নিয়ে যুক্তিযুক্ত মতামত দিয়েছেন। জানা গেছে তাঁদের লেখার নানা দিক, সমকাল সম্পর্কে নানান চিন্তাভাবনা ও রাজনৈতিক সামাজিক দিক নিয়ে লেখকের নিজস্ব মতামত। এর ফলে আমি যথেষ্ট ঋদ্ধ হয়েছি, যা আমার গবেষণার কাজের সহায়ক হয়েছে। এখানে নলিনী বেরা ও রামকুমার মুখোপাধ্যায়-এর সাথে আমার সাক্ষাৎকারটি দিনক্ষণসহ অবিকল উপস্থাপিত করলাম।

নলিনী বেরার সাথে সাক্ষাৎকার

তারিখ : ১৮/৯/২০১৮ মঙ্গলবার

স্থান : কফি হাউসের দোতলায় 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার কক্ষ, কলেজস্ট্রীট, কলকাতা

সময় : বিকেল ৪টা ৩৫ মিনিট

অমর : আমার গবেষণার বিষয়টি হল— 'বাংলা ছোটগল্পে রাঢ়ভূমির সমাজজীবন (১৯৫০-২০০০): নির্বাচিত গল্পকার'। এই সময়কালে আপনি একজন সম্মানীয় লেখক। আপনার কোন্ কোন্ গল্পে রাঢ় অঞ্চলের সমাজজীবনের ছবি ধরা রয়েছে ?

নলিনী : রাঢ় অঞ্চলের ইতিহাস অতি দীর্ঘ। যেখানে রাঢ়ের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিচয় আজও বহমান। ১৯৫০ পরবর্তীকালে আমার গল্পে রাঢ় অঞ্চলের সমাজজীবন খুঁজে পাওয়া যাবে; একদম গোড়ার দিকে লেখা 'শতরঞ্জি', 'ভূত জ্যোৎস্না', 'এই এই লোকগুলো', 'পুষ্করা', 'শীতলামঙ্গল', 'হাঁসচরা', 'অপারেশান পাঁচকাহিনা', 'শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব', 'ঘোড়া ও সর্ষে দানা'— এই সব গল্পে। তাছাড়া আমার তো বেশিরভাগ গল্পই রাঢ় অঞ্চলের উপরেই লেখা।

অমর : রাঢ় অঞ্চল প্রসঙ্গে আপনার চিন্তাভাবনা যদি বলেন ?

নলিনী : এই রাঢ়ের ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাঢ় অঞ্চল বলতে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদের কিছুটা অংশ— এগুলো সমস্তই রাঢ়ের মধ্যে পড়ে।

অমর : তাহলে কি গঙ্গার পশ্চিম দিকের অংশ ?

নলিনী : হ্যাঁ। পশ্চিম দিকটা। তা একেবারে উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত। আর ওদিকে ছোটনাগপুরের মালভূমি পর্যন্ত এটাই রাঢ়। আলেকজান্ডারের যে অভিযান তখন থেকেই কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলের ইতিহাস। তার আগে পুরোটাই মেথোলজি আমাদের পুরাণ। তখন অবধি আমাদের কোন ইতিহাস নেই।

অমর : অর্থাৎ ৩২৫ খ্রি. পূর্বের কথা বলছেন ?

নলিনী : হ্যাঁ। আলেকজান্ডার এলেন, মেগাস্থিনিস এলেন, টলেমি এলেন, ইতিহাস বা ভূগোলবিদরা এলেন। এরা এসে ভারতবর্ষের যে সমস্ত জায়গা দেখেছেন অর্থাৎ যতটা আসতে পেরেছেন তা বিবরণ দিয়েছেন। আর সেগুলোই আমাদের ইতিহাসের উপাদান হয়েছে। ফলে পরবর্তী

সময়ে এটা চলতে চলতে বুদ্ধ জন্মালেন। বুদ্ধ তো আলোকজান্ডারের প্রায় কাছাকাছি সময়ের মানুষ। খ্রিস্ট জন্মের তিনশ বছর আগের কথা, তা বুদ্ধ মারা গেলেন কিন্তু সেই সময়কার যে এলাকাটা ছিল তখন কিন্তু রাঢ় ছিল না। রাঢ় খুবই প্রাচীন এবং রাঢ়ের যাবতীয় যে অঞ্চলটা আছে, তা পুরাভূমির মধ্যে ছিল। এই পুরাভূমি কোনটাকে বলা হয় ? তা হল হিমালয় যখন সাগরে ডুবেছিল, হিমালয়ের যখন জন্ম হয় নি তখনও কিন্তু আমাদের ছোটনাগপুরের মালভূমি তৈরি হয় নি। এবং ভূ-আন্দোলনের ফলে তখনও হয়তো নদীগুলো চাপা পড়ে যাচ্ছিল আবার নদীগুলো উঠছিল সুতরাং এইভাবে হতে হতে, আমাদের চারটে নদী বিশেষ করে দেখা গেল দামোদর, সুবর্ণরেখা, কোয়েল, বরাকর এই সমস্ত নদীগুলো তখন আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তখন হয়তো এদের সঠিক নাম ছিল না। রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে যে সব জায়গাগুলো প্রসিদ্ধি লাভ করছিল বিশেষ করে আমাদের ঐ অঞ্চলটাতে সেটা হচ্ছে তাম্রলিপ্ত সাম্রাজ্য, আর দন্ডভূক্তি সাম্রাজ্য। এই দুটোই প্রাচীন। দন্ডভূক্তি যেটা বর্তমানে দাঁতন সেটা একসময় দন্তপুর নাম ছিল। দন্তপুর মানে বুদ্ধের একটা দাঁত নিয়ে কিংবদন্তী ছিল— সেই থেকে দন্তপুর। বুদ্ধের মৃত্যুর পর দাহ করার সময় এক ভক্ত একটি দাঁত কুড়িয়ে পান এবং উৎকলের রাজাকে দেন। তিনি ঐ দাঁতটি নিয়ে একটি স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করেন। তা বলে এখন আর সেই সব মন্দির নেই। তবে এভাবেই দন্তপুর নামটা হয়— দাঁতন। এবং এটা ৩০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি। তখন থেকেই দন্তভূক্তি নামটা আছে। এটা পুরাভূমি ও একেবারেই প্রাচীন। আর তখনই দণ্ডভূক্তি, তাম্রলিপ্ত এই দুটি অঞ্চল রাঢ়ের মধ্যে ছিল। বিশেষ করে দক্ষিণ রাঢ়। রাঢ়ও দুভাগ হয়ে যায়— উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। উত্তর রাঢ়ের মধ্যে বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া পড়ে।

অমর : আর দক্ষিণ রাঢ় বলতে ?

নলিনী : দক্ষিণ রাঢ় হল মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, হাওড়া, হুগলি— এই অঞ্চলকে একসময় সুহ্মও বলা হত। আর এক সময় বঙ্গও বলা হত। গৌড়বঙ্গও বলা হত।

যে অঞ্চলে আমি জন্মেছি তা রাঢ় তো বটেই পুরাভূমিও বলা হত। আমরা যাদের এখন সাবঅলটার্ন বলি সেই সাবঅলটার্ন নামক পিতৃপুরুষদের বসবাস ছিল এখানে। ওরাও সাবঅলটার্ন। এদের মধ্যে সাঁওতাল, লোধা, শবর, মুন্ডা, খেড়িয়া এই সমস্ত আদিবাসীরা বসবাস করত। সুবর্ণরেখার দুই তীরে অনেকটা জায়গা জুড়ে একদিকে তাম্রলিপ্ত ওদিকে উৎকল সবটা মিলেই সেই সমস্ত মানুষজন বাস করত। আমরা বিশেষ করে, আমি লেখক হিসেবে মনে করি যে ওরাই আমার পূর্বপুরুষ। আমি তাদেরই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছি।

ফলে আমি যে গ্রামটাতে জন্মেছি সেই গ্রামটা একেবারেই উড়িষ্যা সীমান্তের কাছাকাছি। মানে কিছুটা দূর হাঁটলেই আমাদের বারিপদা পড়ছে যা উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের কাছাকাছি।

এখানে বসবাস করা মানুষদের মুখের ভাষা, তাদের কৌম তাদের সংস্কৃতি একেবারেই আলাদা। সেটা এখন পর্যন্ত তাদের মধ্যে বহমান। কারণ ওখানে যেহেতু আর্য সভ্যতা ঢুকতে পারেনি সুতরাং অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি এখনও বহমান। এমন যে জায়গাটা যেখানে পাণ্ডববর্জিত একটা গ্রাম বলা যায়। যেখানে সচরাচর সভ্যতার আলোই নেই। বহুদিন পর্যন্ত আলোর কোন সংস্থান ছিল না। বিদ্যুৎ তো ছিলই না। আর ঐ গ্রামটার মধ্যে কোন শিক্ষিত লোকই ছিল না।

আমার বাবা ক্লাস থ্রি, ফোর পর্যন্ত পড়েছিলেন। তিনি সংস্কৃত জানতেন না। কিন্তু তিনি যেটা করতেন সেটা হচ্ছে কথকতা। কথকতা বলতে আমাদের গ্রামের যে হরি মন্দির আছে বা আসপাশের গ্রামের যে হরিমন্দির বা চণ্ডীমণ্ডপ যেটাকে বলা হয়। তখনকার দিনে ঐ সমস্ত জায়গায় আড্ডার সাথে গ্রামের মানুষেরা রামায়ণ, মহাভারত শুনতে পেত। সেখানে শ্রীমদভাগবত পাঠ হত। প্রভাস খণ্ড বলে একটা রয়েছে ওটা পাঠ হত। হরিবংশ পাঠ হত। আমার বাবা মূলত রামায়ণ, মহাভারত কথকতার ঢঙে সেটাকে পাঠ করতেন।

অমর : আপনি যখন এইসব দেখেন তখন কত বড় আপনি ? মানে কোন্ ক্লাসে পড়তেন ?

নলিনী : হ্যাঁ প্রাইমারী স্কুলে যখন পড়ছি তখন একেবারেই ছোট সেই সময়ে দেখেছি। আর তা ছিল শীতের দিনগুলোতে। আমি খুবই দরিদ্র পরিবারে জন্মেছি। শীত নিবারণের জন্য একটা কাঁথার মধ্যে বাবা ও আমি শুয়ে থাকতাম। বাবার গায়ের উষ্ণতাটা পেতাম তাতেই অনেকটা শীত দূরীভূত হত। শীতের রাতে অনেক সময় ঘুম ভেঙে যেত। শুনতে পেতাম বাবা গুন গুন করে একটা সুর ভাঁজছেন। সেই সুরটা জন্মাবধি তো বটেই আমি এখন অবধি সেই সুর ভুলতে পারিনি।

অমর : সেই লোকায়ত সুর নিয়েই কি এখন পথ চলা, বেঁচে থাকা ?

নলিনী : হ্যাঁ। সেই সুরটা এই রকম—

“হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ হরে।
কৃপা কর রমানাথ মুকুন্দ মুরারে।।”

— এই সুর ভাঁজতে ভাঁজতেই ঘরের আলো জ্বালাতেন। অর্থাৎ ডিবরি জ্বালতেন। যেটা কিনা কেরোসিন বা রেড়ির তেলে জ্বলত। বাবা লালশালুতে মোড়া রামায়ণ ডিবরি জ্বেলে পড়তেন। আলো জ্বালার সময় সেই সুরটাই বজায় থাকত দীর্ঘক্ষণ, ওটাতেই কথকতা করতেন—

আলো জ্বালি দেখ এবে জাগ চেয়ে সতী।
তোমা হিংস্রী কীচকের এ হেন দুর্গতি।।
“মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।”

হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ হরে।

কৃপা কর রমানাথ মুকুন্দ মুরারে।।

— আমি এককথায় বলতে পারি সেই কথকতার সুর, সেই কথকতার ঢং মূলত আমার সাহিত্যের যে খাঁচা, গল্প, উপন্যাসের যে আড়াধাড়া সবটাই কিন্তু ঐ খান থেকেই।

অমর : অর্থাৎ সেই সুর আজও বহমান। এটাকেই কি সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা বলব ?

নলিনী : হ্যাঁ। তুমি যদি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের দিকে তাকাও যে সাহিত্য আমাদের একেবারেই নিজস্ব। সে সাহিত্য আমাদের কথকতা, পাঁচালী, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, বা পরবর্তী সময়ে মঙ্গলকাব্য এগুলোর মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে আমরা তো উঠে আসছিলাম এবং ঐ যেমন কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম বর্ধমান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন তুর্কিদের অত্যাচারে, তারপরে মেদিনীপুরের আড়রাতে এসে সভাকবি হয়ে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। মঙ্গলকাব্যে দেবতার মাহাত্মই বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তেমন ছিল না। কিন্তু কবি কঙ্কনের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকেই কিন্তু এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তথা বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম সাবঅলটার্ন মানুষের কাহিনি রচনা করতে শুরু করেন। যে আড়রা গ্রামে বাস করতেন, তার পাশাপাশি যে জঙ্গল ছিল সেই জঙ্গলের মধ্যেই ফুল্লরা কালকেতুর বসবাস ছিল। তাদের দেখে, তাদের জীবন কথাই কাব্যে ঠাঁই দিয়েছেন। অনেকে বলেন ফুল্লরা কালকেতুর নামে ব্রতকথা ছিল, ব্রতকথা ঠিক নয়। এ জঙ্গল থেকেই প্রথম অন্ত্যজ মানুষকে আবিষ্কার করেন। ঐ কাব্যেই মুকুন্দরাম বলেন—

'কৃতাঞ্জলী বীর কহে হই গো চুয়াড়

কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।।'

অর্থাৎ কেউ আমাকে ছোঁয় না, আমাকে অচ্ছুত মনে করে, আমাকে রাঢ় ভাবে। এই যে রাঢ়ের মানুষ, অন্ত্যজ মানুষ প্রান্তিক মানুষ, সাবঅলটার্ন মানুষ— এদের কেউ ছুঁতো না। এমনকি ফুল্লরাকেও গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হত না। ওকে ঢুকতে হলে আগে গ্রামের মাথায় ঘন্টা বাজাতে হত, যে আমি আসছি। আর তার দ্রব্যাদি কিন্তু গ্রামের বাইরেই বিক্রি করতে হত। কাব্যে আছে—

'ফুল্লরা বেসাতি করে নগর (গ্রাম অর্থে) বাহিরে

হাঁড়িয়া চামর বেচে চারি প্রহর ধরে।।'

—এই হাঁড়িয়া, চামর— লোকখাদ্য, পরিধেয় ছিল তখন। এদেরই উত্তরপুরুষ আমরা।

অমর : আপনার লেখায় কি এইরকম অন্ত্যজ মানুষেরাই ভিড় করেছে ?

নলিনী : অবশ্যই। আমি জন্মানোর পর যে সমস্ত মানুষদের দেখেছি তারা সবাই প্রান্তিক মানুষ,

সবই সেই অন্ত্যজ মানুষ, আমি সেই মানুষদেরই একজন, সাবঅলটার্ন মানুষ। আমার তাবৎ গল্পের যে উত্থান, তার যে প্রেক্ষাপট, এবং তার মধ্যে যে চরিত্রগুলো আছে তাদের আদিমতা এবং অধুনা-আধুনিকতা এখনও পর্যন্ত তারা বহমান। সেই সুর তো এখনও নেভে না। সুতরাং এই যে অনন্ত একটা প্রবাহ, অনন্ত প্রবাহেই অনন্ত কথকতা, আমি তাদেরই একজন। সামান্য কথকমাত্র। আমার সমস্ত গল্পের প্রেক্ষিত তথা রাঢ়ের প্রেক্ষাপট হল এটাই।

অমর : অনেকের সাথে আমিও একমত যে আপনার লেখায় তথা ছোটগল্পে রাঢ় অঞ্চলের সমাজ জীবনের ছবি ধরা রয়েছে— একথা কি সত্যি ?

নলিনী : হ্যাঁ। আমি তো রাঢ়েরই মানুষ। এতক্ষণ যে আমার পিতৃপুরুষদের আখ্যান বললাম সেখান থেকে একটা ধারাবাহিকতা একটা কথকতার আদল আমার মধ্যেও আছে।

অমর : রাঢ় অঞ্চলের মানুষের ভাষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে আপনি কি বলবেন ?

নলিনী : ভাষা-সংস্কৃতি বলতে ওখানকার লোকায়ত গান, নাচ, নাট্য রয়েছে। আর সুবর্ণরৈখিক একটা ভাষা রয়েছে। এই ভাষা তৈরি হওয়ারও একটা প্রেক্ষাপট রয়েছে। কারণ এই যে তাম্রলিপ্ত, দন্তভুক্তি, উৎকল, কলিঙ্গ বা গৌড়— এই যে প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোর কথা বলা হয় ঐ অঞ্চলটা বিভিন্ন সময়ে কারো না কারো অধীনে থাকত। কখনো তাম্রলিপ্তের অধীন, কখনো কলিঙ্গ, তো কখনো বর্ধমান ভুক্তির অধীনে পড়েছে। আমি যে অঞ্চলে বসবাস করেছি সেখানে সুবর্ণরৈখিক ভাষা ছিল। তার পাশাপাশি এলাকাতে এই ভাষার প্রচলন ছিল। এই ভাষা নিয়ে সাহিত্য তেমন একটা হয় নি। আমরাই বেশি করে এই ভাষাটা প্রয়োগ করছি আমাদের গল্প উপন্যাসে। এই ভাষাটা অদ্ভুত ধরনের। এতে ওড়িয়া মিশেছে, বাংলা মিশেছে, কুর্মালী ভাষা কিছুটা মিশেছে, সাঁওতালী ভাষাও কিছুটা মিশেছে।

অমর : এই কুর্মালী ভাষা কি মাহাতো সম্প্রদায়ের লোকেরা বেশি ব্যবহার করেন ?

নলিনী : হ্যাঁ, মাহাত-রা ব্যবহার করে। তবে অরিজিন্যাল যে কুর্মী, কুর্মীদের ভাষা সেই ভাষাটা এখন আর তেমন প্রচলিত নেই। এখন যে কুর্মালী সেটা মোটামুটি লোকায়ত। মুখে মুখে পরিবর্তন হতে হতে সরলীকরণ হয়ে গেছে, সেটা নেই আর। ঐ সুবর্ণরৈখিক ভাষাকে হাটুয়া বলা হত। আদর্শ বাংলা ভাষার সাথে এর তফাৎ রয়েছে। এই অঞ্চলের ভাষা যেমন— ব্রাহ্মণ এল, হাতের তালি মেরে পুজো করল, সিধে বেঁধে বাড়ি চলে গেল— এই কথাটা ঐ ভাষায় হয়— 'আইলা বামন মাইলা তালি ঘেনি পলাইলা চাউল থালি।' এই ভাষাটাই হাটুয়া ভাষা। বা বলা হয় যেমন— 'ক্যান ডাকছুলু বল', 'কেন ডাকছিলি বল', এই যে ভাষাটা কিন্তু ওদের মুখের ভাষা এবং ওদের মাতৃভাষাই বলতে পারি। বাংলা ভাষা বলতে ঐ সমস্ত মানুষদের কাছে বিদেশি ভাষা। ওখানে তেমন বাংলা প্রচলিত নেই।

অমর : গল্পে গান বা নাচের কথা পাওয়া যায় তা কি রাঢ় অঞ্চলের মানুষদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ?

নলিনী : হ্যাঁ। এই অঞ্চলে যেমন ভাষা-সংস্কৃতি রয়েছে তেমনি গান যেমন— তুসু গান, ঝুমুর, ভাদু, কাঁদনাগীত, খুবই প্রচলিত রয়েছে। এই কাঁদনাগীত কনে বিদায়ের সময় গাওয়া হত। তার জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হত। বর কনে বিদায় কালে পালকি থেকে পেছন ফিরে মেয়েটি (কনে) তার মাকে পেছন ফিরে দেখত। পরিবারে মা, বাবা, দাদা, বউদি, ভাই-বোন সকলের কাছ থেকে কিভাবে বিদায় নেবে তার জন্য গান রচিত হয়েছে। কাঁদনা গীত নামে বই পাওয়া যেত। তা দেখে অভ্যেস করত বিদায়ের করুণ মুহূর্ত।

অমর : এটা কি মহাশ্বেতা দেবীর 'রুদালী'র গল্পের মতো ভাবনা অনেকটা ?

নলিনী : হ্যাঁ রুদালীর মতো। 'কাঁদনা গীত' পাওয়া যায়। একে বলে 'গেহেলা ঝিওর' মানে 'আদুরে মেয়ে'। শকুন্তলা পতি গৃহে যাত্রার সময় যেমন অনুসূয়া, প্রিয়ংবদা, হরিণশাবক, প্রকৃতির কাছে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিয়েছিল তেমনি আমাদেরও যুবতী মেয়েরা বিয়ের সময় বাবা-মা'কে জড়িয়ে কি কান্না কাঁদবে তা মুখস্ত করত। তাকে বলে— রোদন। তা বইয়ে লেখা থাকত। অনন্ত দাস নামে কে ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর লেখা প্রচুর বই পাওয়া যেত। তিনি পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচতে নাচতে 'গেহেলা ঝিওর', কাঁদনা গীত' এইসব বই বিক্রি করতেন। তার একটা গীত এই রকম—

'উঠিলা সোয়ারী বসিলা নাহি মাগো
ফিরি চাঁহি বাকু দিশিলা নাহি মাগো'—

—এই যে বিদায় মুহূর্ত চিরন্তন করুণ আর্তি— এটাই লোকায়ত সংস্কৃতি। লোকায়ত ভাষা যেমন আছে লোকায়ত সংস্কৃতি তেমনি রয়েছে। আর আমরা এই ভাষা, লোকায়ত গীত সংস্কৃতি থেকেই মানুষ হয়ে উঠে আসছি। ফলে আমার লেখালেখিতে এইসবই রয়েছে। সেই অনার্য ভারতবর্ষের ইতিহাস যেন একটু একটু করে রচিত হচ্ছে। ওখানকার মানুষদের চরিত্র চিত্রণ করতে গেলে লোকায়ত সমাজ তো থাকবেই।

অমর : সমকালীন বাস্তবতা বলতে নকশাল আন্দোলনের সময় থেকেই কি আপনার গল্পগুলো বেশি করে জায়গা পেয়েছে ?

নলিনী : হ্যাঁ। ঠিক ঠিক। যে অঞ্চলটা যেভাবে চলে আসছিল হঠাৎ সেখানে একটা বিক্ষুব্ধ মনোভাব নিয়ে আন্দোলন তৈরি হল। প্রথমত, নকশাল আন্দোলন, তারপরে, মাওদের বিবর্তন— এই দুটো আন্দোলন মুখ্যত সত্তর দশক থেকে ঐ জায়গাটাকে প্রায় আলোড়িত করে ফেলেছে ভয়ংকর ভাবে। সেই জঙ্গলমহল যেটা এখন প্রায় জগৎবিখ্যাত।

অমর : আপনার 'অপারেশান পাঁচকাহিনা' গল্প তো জঙ্গলমহলের পটভূমিতে রচিত। এখানে যমুনার হাতে না লেখা পিটিশন, দৌড়ে যাওয়া, অসংখ্য মানুষের প্রতিনিধি হয়ে না লেখা কাগজে অসংখ্য প্রশ্ন পৌঁছে দেওয়া। যমুনাদের এই যে চেতনা, অভাবের তথা নানান

সমস্যার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা— এটা যেমন প্রতিবাদ, তেমনি সরকার বাহাদুরকে প্রতিবাদের ইঙ্গিত— এটাই কি বাস্তব, এভাবেই কি অনালোকিত অঞ্চল ও অনালোচিত মানুষদের বাঁচিয়ে রাখতে চান ?

নলিনী : অবশ্যই এগুলোই গল্পে উঠে এসেছে। গল্পগুলো কোনমতেই সেকেলে গল্প নয়। আধুনিক সমাজ, সবগুলোই আধুনিক ভাবনার কথাই বলছে।

অমর : আপনার সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যদি কিছু বলেন ?

নলিনী : আমি যে অঞ্চলে বসবাস করতাম সেই রোহিণী, সুবর্ণরেখা অঞ্চলে পঠন-পাঠন করা কালে দেখতাম একটু নিচুতলার মানুষদের তথা অন্তেবাসী মানুষদের প্রতি একটা ঘৃণার চোখ ছিলই। আর অন্তেবাসী মানুষদের না পাওয়ার তালিকাটা ছিল অতি দীর্ঘ। আর আমি তাদের প্রতিনিধি হয়ে আমার কলমকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছি। এটা কিন্তু বাস্তব। একেবারেই বাস্তব। সুতরাং শুধুমাত্র যে সারস্বত সাধনার জন্য এই লেখা-লেখি তা একদমই নয়। কারণ আমি মনে করি নির্যাতিত, নিপীড়িত লাঞ্ছিত এবং নানানভাবে অবহেলিত এই আমি তাদের কাছ থেকেই উঠে এসেছি— এই সমস্ত মানুষজন কিন্তু আমারই আত্মীয়, আমারই পরিজন। সুতরাং এদেরই দুঃখ-কষ্টের ভাগীদার হয়ে তাদের জন্যই কিছু কথা বলা। যেটা আমার হয়ে হয়তো 'অপারেশান পাঁচ কাহিনা'র 'যমুনা' বলতে চেয়েছে সাদা পাতার দরখাস্তে। যমুনা দুঃখের বার্তা বহন করে নিয়ে চলেছে।

অমর : 'ভূত জ্যোৎস্না' গল্পে সৃষ্টিধর আগুয়ান হেডমাস্টার অমূল্যধন দে-কে পি.কে.দে সরকারের বই থেকে ট্রানশ্লেশান শেখায়। যেখানে হেডমাস্টার ডবল্ এম.এ., আর সৃষ্টিধরের পেশা পাঁঠা বাচ্চার অন্ডকোষ কেটে খাসি করা। পেশার সাথে শিক্ষার এই অসামঞ্জস্যতা দেখানোর উদ্দেশ্য যদি বলেন ?

নলিনী : একটা রাতে ভূতগ্রস্ততা যদি ঘটে। যেখানে মড়া পোড়ানোর কাঠ রহস্যের কিনারে নিয়ে যায়। তাই সব উল্টে যায়। হেডমাস্টারের থেকে ডোম সৃষ্টিধর অনেক উঁচু হয়ে উঠেছে। একজন দাই যে বাঁশের পাতি দিয়ে নাড়ি কেটে বেড়ায় সে কিন্তু বিডিও-কে ইংরেজি ভাষণের বঙ্গানুবাদ করে দেয়— এমন যদি ঘটে যায়, অন্ত্যজ সমাজের মানুষরা উঠে আসে যদি হঠাৎ করে, তখন শিক্ষিত মানুষদের অবস্থাটা বোঝাতে চেয়েছি। তা তো হঠাৎ হবে না। তাই জ্যোৎস্নালোকে ভূতগ্রস্ততা একটা মোহগ্রস্ততার মধ্য দিয়ে যদি পরিস্থিতি বদলে যায় এই বৈপরীত্য ভাবনা ধরতে চেয়েছি।

অমর : সমাজ জীবনের পরিবর্তন কি এভাবেই দেখতে চেয়েছেন ?

নলিনী : হ্যাঁ। আমি এভাবেই দেখতে চেয়েছি।

অমর : পুষ্করা বলতে কি ? এটা কি কোনো কুসংস্কার ?

নলিনী : গ্রামে ভাস বলে এক ব্যক্তি থাকে। যে কিনা দোষ-গুণ, পাপ-পুণ্যের বিধান দেয়। প্রায়

সব গ্রামেই এই ভাস পণ্ডিতরা থাকে, তারা গণনাও করে। আর পুষ্করা বলতে একটা দোষ। পাপেরই পরিণাম। ঘরের চালে কাল পেঁচা বসলে পুষ্করা হয়েছে বলা হয়। প্রচলিত আছে যে পুষ্করা কোন বাড়িতে ধরলে প্রথমত, ছোট প্রাণির জীবনহানি ঘটে। তারপর বৃহত্তর প্রাণির জীবনহানি হতে হতে মানুষের জীবনহানিও হতে পারে। এই তার বিধান।

অমর : গল্পে কি কেবল বাস্তবতাই তুলে ধরেন না কল্পনারও আশ্রয় নেন ?

নলিনী : গল্পে বাস্তবতা থাকেই কিন্তু তার মধ্যে কল্পনাও যে নেই এমন নয়। কল্পনা ছাড়া গল্প হয় না, কিন্তু তার বাস্তব ভিত্তি থাকবেই। আমাদের বেদান্তই বলেছে— 'ন অসত শত জায়তে।' মানে কোনো একটা অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বের জন্ম হতে পারে না। অস্তিত্ব থেকেই বরং অস্তিত্বহীনতাতে যাওয়া যায়। আসলে ফ্যান্টাসি থেকে বাস্তবে আসা যায় না বরং বাস্তব থেকে ফ্যান্টাসিতে যাওয়া যায়। এটা পাশ্চাত্যের অস্তিবাদী দর্শন। 'We have todays not tomorrow' আমাদের বর্তমানটা আছে ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। আমরা যা চোখে দেখি সেটাই সত্য বাকিটা যেন অবাস্তব। বেদান্তের ভাবনায় তা নয়, তবে এটাকে পরাবাস্তব বলতে পারি। যেমন আমার 'পুষ্করা' গল্পে ভাস পণ্ডিতের কাছে যেতে সে বলল পুষ্করা দোষ লেগেছে। তাই প্রথমে ছোটখাটো প্রাণিগুলো মরতে শুরু করবে যেমন গরু, ছাগল, মুরগি, হাঁস ও পরে ছোট শিশুরা মরবে। তারপর বড়রা মরবে যদি তুমি না প্রায়শ্চিত্ত কর। তবে আমি দেখেছি আমাদের একটা মোষ মারা গেল, তারপর ন'কাকার ছেলে ক'দিনের জ্বরে ভুগে মারা গেল। তখন বড়রা ভয় পেল এবং ভাবল এর প্রায়শ্চিত্ত না করলে বিপদ। প্রায়শ্চিত্তের জন্যে একশত আটটা পদ্ম কেনা হয়। সেই পদ্ম কিনতে আমাদের ছোটকাকা গিয়েছিলেন। তখনও আমরা এত পদ্ম একসাথে দেখিনি। সেই প্রথম জীবনে পদ্ম দেখলাম। কুঁড়ি বা নিমীলিত পদ্মগুলো দেখার জন্য গ্রামের সবাই এসেছিল। এই ব্যয়বহুল খরচে, মানসিক শান্তি ফিরে পাওয়া তখন আমাদের ঐ অঞ্চলে কুসংস্কার হিসেবে প্রচলিত ছিল। আমার 'ঘোড়া ও সর্ষেদানা'তেও এমন জাদুবাস্তবতার পরিচয় রয়েছে। এগুলো তথাকথিত জাদু বাস্তবতা নয়, সমাজজীবনের বাস্তবতা থেকেই পাওয়া।

অমর : 'এই এই লোকগুলো' গল্পে কথক নান্টু ছ'ধরনের লোকের সাথে বেঁচে থাকে তার রাগ ও অভিমানকে সম্বল করে। নাপিত প্রমথ পরামানিক, হংসবধুক, নিকুঞ্জ, বাসের কনট্রাক্টর, হোটেল মালিক জগন্নাথ, আর অপিসের ছায়াসঙ্গী-রা কি নান্টু তথা স্বয়ং লেখকের সাথে আজও রয়েছে না তারা অতীত হয়ে গেছে ?

নলিনী : না, অতীত কি করে বলি ? জলজ্যান্ত এখনও। এদের থেকে আমি আঘাত পেয়েছি অনেক। যে আঘাত থেকে আমার একটা বিক্ষুব্ধ মন তৈরি হয়েছিল। হাওড়ায় জগন্নাথের প্রাইস সিস্টেম হোটেলের কাহিনি খুবই অপূর্ব ও দুঃখজনক।

অমর : এই হোটেলেই কি সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের O.D.B.L. বই দিয়ে খেতে চেয়েছিলেন ?

নলিনী : হ্যাঁ, এখানেও বাস্তব জীবনটাই উঠে এসেছে। হাওড়াতে থাকতাম। জগন্নাথ উৎকলের মানুষ বলে আমার জন্ম উৎকল সীমান্তে বলে কোথাও যেন একটা মিল পাচ্ছিলাম। হোটেল মালিক জগন্নাথের সাথে রাজা রাজড়াদেরই গল্প হত, উৎকল রাজাদের। আমি বলতাম আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা ময়ূরভঞ্জের রাজার গোমস্তা ছিলেন। হাতির পিঠে চড়ে সেরেস্তাতে যেতেন। এই সব শুনে জগন্নাথ খুশি হত। তবে এই সব গল্পের সত্যতা ছিল একেবারে জমিহীন দিন মজুরের মতো ছিল আমাদের অবস্থা। কিন্তু ঐসব গল্প দিব্যি ওকে শোনতাম। আমারও যেমন ভালো লাগত ওরও তেমনি ভালো লাগত। এইভাবেই একটা বন্ধুর মতো সম্পর্ক হয়। তখন আমি ওর সাথে একটা মান্থলি সিস্টেম করি, সব বেলা খাবার ওখানে খেতাম। তো মাসের শেষে পয়সা দিতে পারিনি। আমি তখন সুনীতিকুমারের O.D.B.L. বইটা হাতে দিলাম। তখন ও পাতা উল্টে ছবি খুঁজছে, তারপর হাতের তালুতে নিয়ে ওজন কত হবে বিক্রি করে কত পাবে তা ভাবছে। তারপর বই আমার হাতে ফেরত দিয়ে বলল— 'হবে না' তখন ভয়ংকর রাগ হয়েছিল। জগন্নাথ কিনা হোটেলের মালিক সে O.D.B.L. এর মতো বইয়ের বিনিময়ে আমাকে খেতে দিল না। তাই সমাজের প্রতি আমার রাগ। এইরকম রাগগুলো একসাথে 'এই এই লোক গুলো'তে বলে দিয়েছি। সুতরাং আমার মনে এখনও একটা বিশুদ্ধ রাগের ভাব তো আছেই কারণ আমি যে বলছি তা তামাম অনার্য ভারতবর্ষের হয়ে কথা বলছি। আমাদের এই ভারতবর্ষ আদিকাল থেকে দুটো ভারতবর্ষ হয়ে চলে এসেছে একটা আর্য ভারতবর্ষ ও অন্যটা অনার্য ভারতবর্ষ। এই অনার্য ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ শতাংশ মানুষ দু'বেলা খেতে পায় না, অনার্য বলতে তথাকথিত প্রান্তিক, অন্ত্যজ, দলিত নানারকমের মানুষজন— এদের জন্য আর্যরা কিন্তু ইতিহাস লেখার কথা একবারও ভাবেনি। আমি 'শবর চরিতে' লোধাদের প্রসঙ্গ এনেছি যেখানে প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানে সভ্যতার প্রকৃত পরিচয় উঠে এসেছে।

অমর : রাঢ় অঞ্চলের এই সমাজজীবনের পরিবর্তনে আপনি কতটা বিশ্বাসী এবং তা কীভাবে সম্ভব ?

নলিনী : দেখো সভ্যতা এগোয়। সভ্যতা তো কখনো পিছোয় না। একটা নদী বেগবান, স্রোতবান। নদী কিন্তু সামনের দিকে চলে। তেমনি এই সভ্যতা, এই দিন, বদলায়। তেমনি আমাদের অতীতে দেখা স্থানিক যেগুলো তা আজ বদলাচ্ছে। গ্রামের ভেতর শহর ঢুকে যাচ্ছে, শহুরে সংস্কৃতি ঢুকছে। আমাদের গ্রামীণ যে ঐতিহ্য ধারাবাহিকতা যেটা আছে সেটা কিছুটা বাধা পাচ্ছে। ঠিক ঠিক বিকশিত হচ্ছে না, বা আমরা ফেলে আসছি নানা জিনিস। বরং কিছু উপজাতি তাদের ঐতিহ্যকে আঁকড়েই উন্নতি করেছে। এই পরিবর্তন গুলো তো আসছে। আমাদের ঐ অঞ্চলটাতে নকশাল আন্দোলন বা মাওবাদীদের আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। কারণ সেই সমস্ত জায়গাগুলোর প্রতি প্রশাসকের

তথা শাসক গোষ্ঠীর দৃষ্টি পড়েছে। এতদিন দৃষ্টি পড়ত না। ফলে ‘অপারেশন পাঁচ কাহিনা’র ‘যমুনা’র মতো মানুষেরা কোথায় দরখাস্তটা পেশ করবে তা জানতই না। সুতরাং যমুনারা সচেতন হয়েছে। তথাকথিত দলিত মানুষেরা অভাবের কথা বলতে চেয়েছে। তাদের বাঁচার অধিকার, অরণ্যের অধিকার প্রসঙ্গে তারা জানতে পেরেছে। তাই ‘যমুনা’ সাদা কাগজের দরখাস্ত নিয়ে ছুটেছে। এরা ছুটতেই থাকবে।

অমর : আপনার সমস্ত জীবনানুভূতির নির্যাস কি মনে করেন ? যেখানে আপনি রয়েছেন সেইরকম কি কোন প্রসঙ্গ বা কথা রয়েছে ?

নলিনী : সেটা একধরনের অনুভূতি তো রয়েছে। যেটা নির্যাস বা বোধ বলা হয়। সেই বোধটা জীবন থেকেই উঠে এসেছে। বর্তমানে শহরে বাস করছি। কিন্তু যাদের আমি তথাকথিত পরিজন বলছি, স্বজন বলছি সেই মানুষগুলো আমার সঙ্গে আসেন নি, কিন্তু সেই সমস্ত মানুষের মন সেইগুলোকে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তাঁদের কথাই কিন্তু আমি বলছি।

এই প্রসঙ্গে ‘ভানুমতী’-র (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর আরণ্যক এর) মতো আমার এক দিদির কথা বলি। আমাদের গ্রাম যেখানে, তার এক দু’মাইলের মধ্যেই ছিল একটা সাঁওতালদের গ্রাম ঠাঙাসাঁই তার নাম। সেই গ্রামের এক সাঁওতাল পরিবারের একটি মেয়ের মুখটা পান পাতার মতো দেখতে। আমার মেজদির মুখটাও প্রায় ঐ সাঁওতাল মেয়েটির মতো পান পাতার মতো, এমনকি ঘোর কুচকুচে কালো। আমি দেখেছি আমার বাবা মেজদির সাথে সাঁওতাল মেয়েটির ফুল পাতিয়ে দেয়। ফলে দু’জন মেজদি হয় আমার। আমরা তখন খুব ছোট, তারপর বড় হই দিন যায় মাঠে ময়দানে তখন ফুটবল খেলি। ওল ডাঁটাকে শুকিয়ে শনের দড়ি দিয়ে গোল করে বল বাঁধা হত। সাইজ মতো এক নম্বর থেকে চার নম্বর করা হত। আমি গোলে খেলতাম। রোদ্দুরে ঘর্মাক্ত কলেবর। সাঁওতাল মেজদি ঝুড়ি মাথায় মাঠের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখত আমার ছোট ভাই কেমন ঘেমে গেছে। আর তখনই দৌড়ে খেলার মাঠে ঢুকে তার ময়লা আঁচল দিয়ে আমার ঘাম মুছিয়ে দিত। আমি তখন আদর করে জিজ্ঞেস করতাম তুমি আমাদের বাড়ি যাবে না। সে বলত, না রে ভাই কাজ আছে পরে যাব। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে অভাবের দিনে আমরা তেঁতুলের বিচি সেদ্ধ করে ভেজে তাতে গুড় মিশিয়ে ‘লেটো’ করে আমরা খেতাম। ভাত তো পেতাম না। আমাদের অভাবের দিনগুলোয় ঐ ছিল খাদ্য। আর ছিল ভুট্টা, মকাই যেটাকে বলা হয়। মকাই সেদ্ধকে বলে ঘেটো। আমরা লেটো ঘেটো খেয়েই তখন বেঁচে ছিলাম। ভুট্টা ক্ষেত থেকে তুলে রাখার সময় সাঁওতাল মেজদিকেও বাবা দিয়ে আসত। বাবা সাঁওতাল মেজদির বাড়িতে একমাস ধরে থেকে যেত, কুটুম্বিতা করত। তারপর দুই মেজদির বিয়ে হয়ে যায়। আমি ওখান থেকে মেদিনীপুর কলেজ হয়ে ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে এলাম। এখানে এক বাসা বাড়িতে থাকার সময় একদিন দেখি আমার মেজদি দুর্গা প্রতিমার মতো আমার বাসায় বসে আছে। দেখে রাগ হল কারণ সে হয়তো বাড়ির অভাব দুঃখের কথা এখানের সকলকে

বলে দিয়েছে। কিন্তু একটু পরে সে বলল আমি এসেছি তোর জামাইবাবুর পায়ে ঘা, হাঁটতে পারে না, তুই একজোড়া জুতো কিনে দিবি। আমি তখন দু'একটা টিউশন পড়িয়ে নিজের খরচ সামলে চলি। বললাম চাকরি করি না কি করে দেব। তবুও ধার হাওলাত করে একজোড়া অজন্তা চটি জুতো কিনে দিই। মেজদি তা পেয়ে বুকে ধরে বাড়ি ফিরে যায়। যাবার সময় বলেছিলাম যাচ্ছ যাও আর কিন্তু এসো না। আমার মেজদি সত্যিই আর আসেনি। কলেজে পড়তে পড়তেই শুনলাম তিনি আর ইহজীবনে নেই। ডুলুং নদীর পাশে দাহ করার সময় দেখেছি জামাইবাবু সেই চটি জোড়া বড় মায়ায়, দুঃখে পা থেকে খুলে চিতায় তুলে দেয়। মেজদির সাথে চটিজুতার স্মৃতিও আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে গেল। তারপর বহুদিন বাদে চাকরি পেয়ে গ্রামে যেতে মা বলল, তোর মেজদির বাড়ি যাবি না। আমি বললাম, মেজদি ? মা বলল কেন তোর সাঁওতাল মেজদি। তখন তাকে দেখতে ঠাঙাসাঁই যাই। যেতেই, ইগলুর মতো ছোট ঘরে যত্ন করে বসায়। দেখি পায়ে হাজা, ফাটা পা থেকে রক্ত ঝরছে। তখন কেমন যেন মনে হল। আসল মেজদির চটিজুতোর কথা মনে পড়ল। পরেরদিনই বড়ডাঙা বলে একটা গ্রামে জুতো পাওয়া যেত। সেখান থেকে এক জোড়া জুতো আর কিছু টাকা নিয়ে সেই মেজদিকে দিয়ে আসি। বলি টাকা দিয়ে ঔষধ কিনে লাগালে আরাম পাবে। আমি W.B.C.S. অফিসার ছিলাম। চাকরি সূত্রে নানান জায়গায় বদলি হয়েছি। দেশ ঘর প্রায় ভুলে গেছি, কালে ভদ্রে যাই। ওখানে এখন কেউ নেই। বহুদিন পর একবার গ্রামে যেতে মন্মথ নামে বন্ধু সঙ্গে করে সাঁওতাল মেজদির ঘরে নিয়ে যায়। দিদি ঘরে এসে পা ছড়িয়ে বসে। তার পা দেখে আসল মেজদির কথা মনে হল। পা-এর অবস্থা দেখে চটিজোড়া ছিঁড়ে ফেলেছো কিনা জিজ্ঞেস করলাম। সে তখন প্রায় হাঁমাগুড়ি দিয়ে বের করে আনল যত্নে বাঁধা একটা পোঁটলা। সে খুলেই চলেছে তা। সেদিন ঠিক মনে পড়েনি, আজকে মনে পড়ছে— একটু একটু খুলছে আর সে যেন অনার্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতা ওল্টাচ্ছে একের পর এক। খুলতে খুলতে অবশেষে পাওয়া গেল আমারই কিনে দেওয়া স্টিকার সমেত মুগুরমার্কা অজন্তা হাওয়াই। বুকের সামনে জড়িয়ে ধরে রেখেছে জুতো জোড়া। আমি তখন বিস্ময়ে স্তব্ধবাক্। বললাম যে, এই জুতো জোড়া তুমি পায়ে দাও নি ? মেজদি তখন বলল 'তোর দেওয়া চটি জুতা আমি কি পায়ে দিতে পারি রে।' এই যে পরিজন যাদের আমি আত্মীয়স্বজন বলছি, যাদের আমি ফেলে রেখে এসেছি আমার অতীতে। তাদের কি ভোলা যায় ? তাদের কথাই বলছি, তাদের কথাই লিখছি। এই আমার সাহিত্য, এই আমার সাহিত্যের ইতিহাস।

অমর : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, নমস্কার।।

নলিনী : তুমিও ভালো থেকো।।

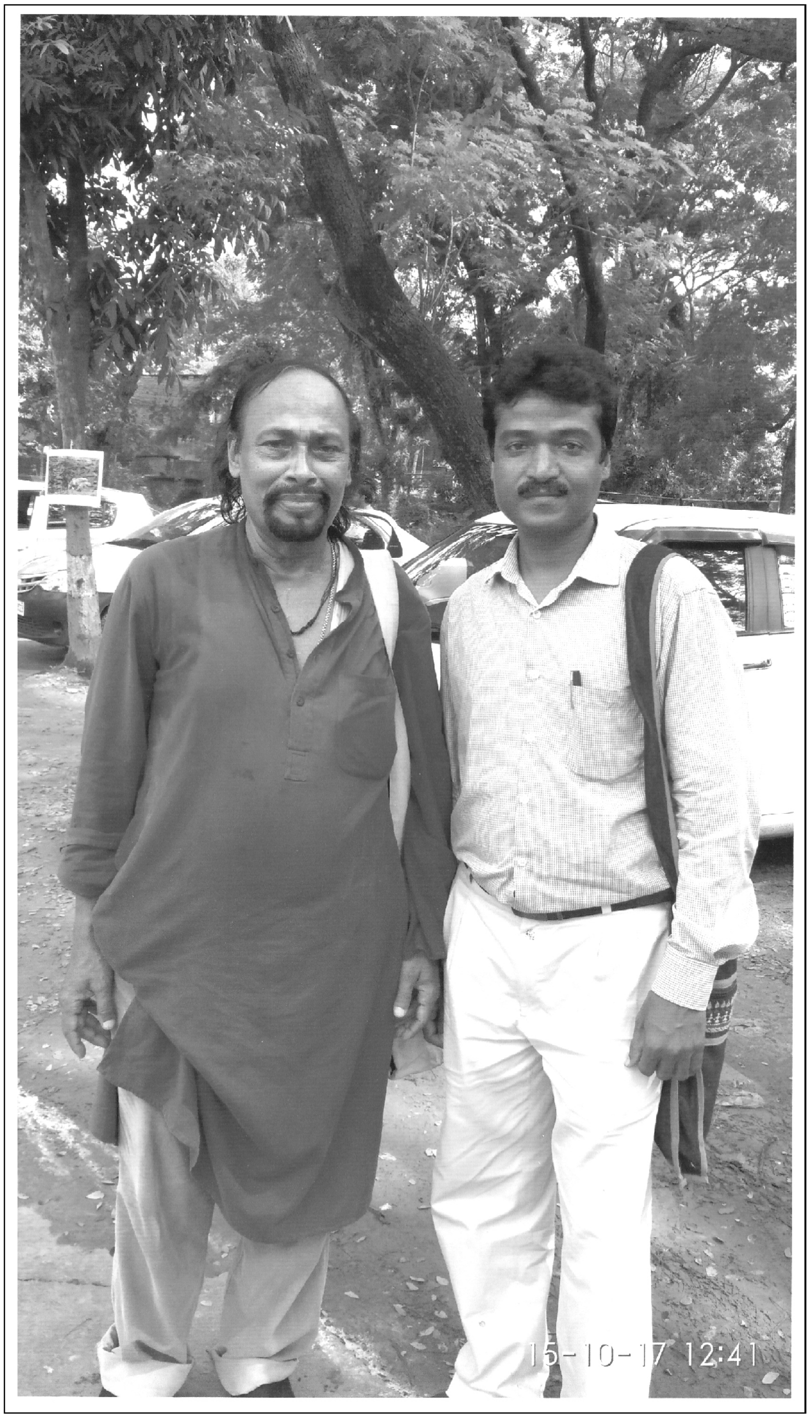

গল্পকার নলিনী বেরা ও গবেষক অমর আদিকারী

তারিখ :১৫.১০.২০১৭

সাক্ষাৎকার গ্রহণের বিশেষ মুহূর্ত

গল্পকার নলিনী বেরা ও গবেষক অমর আদিকারী

স্থান : কলেজ স্ট্রিট, 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার কক্ষ, কলকাতা

তারিখ : ১৮.০৯.২০১৮

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

তারিখ : ০৭/১২/২০১৮

স্থান : স্কাইলাইন এ্যাপার্টমেন্ট, পর্ণশ্রী, বেহুলা, কলকাতা

সময় : সকাল ৯টা

অমর : আমার গবেষণার বিষয় ‘বাংলা ছোটগল্পে রাঢ়ভূমির সমাজজীবন (১৯৫০-২০০০): নির্বাচিত গল্পকার’। এই সময়কালের মধ্যে রাঢ় অঞ্চল ভিত্তিক আপনার কোন কোন গল্পের প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যাবে ?

রামকুমার : আমার তো জন্ম রাঢ় অঞ্চলেই! বাঁকুড়া জেলায়। আমার ‘গল্প সমগ্র’ গ্রন্থে রয়েছে ‘পিকনিক’, ‘হাভাতে’, ‘দায়বদ্ধ’, ‘গোষ্ঠ’, ‘পেয়ারা বুড়ো পান্তাবুড়ি’, ‘আমাদের গ্রাম’, ‘বনমালীর পৃথিবীতে ফেরা’, ‘জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০, মানুষ কিংবা ঘুঘু’, ‘বাঁকুচাঁদের গেরস্থালি’ গল্পে রয়েছে রাঢ় অঞ্চলের বাস্তব সমাজজীবনের পরিচয়।

অমর : আমার গবেষণার সময়কাল ও বিষয় সম্পর্কে যদি কিছু বলেন ?

রামকুমার : অনেকে পুরোনো কাজই করেন। আসলে ১৯৪১ এর আগে ধরলে আমাদের রবীন্দ্রনাথ একটা বর্ডার রয়ে গেছে। তারপরে তারাশঙ্কর, বিভূতি, মানিক ও সেভাবে সতীনাথে ঢোকা হয়নি। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে অন্যেরা যার উপর আলোচনা করেছে সেটা নতুন করে আলোচনা করার থেকে যা আগে কেউ করেনি তা করাই ভালো। গবেষণা তো তাই। ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যখন গল্প লিখি তখন ধরো নতুনত্ব টুকুই আমার সৃজন। বাকি টুকুনের তো কোনো অর্থ নেই। বাকিটুকু কেবল তৈরি করতে হয়। একটা ভিত দিতে হয় বলে, কিন্তু মূল কারণটা তো হচ্ছে যে আমি নিজে কি। বাকিটা আমি তো সংগ্রাহক শুধু নই। আমি লেখক বা গবেষক। সুতরাং গবেষণা করে তো নতুন কিছু বার করতে হয়। এখন পুরনো দরজায় বসে থাকলে কতটা নতুন পাওয়া যাবে ?

অমর : আপনার গল্পে লোকায়ত সমাজজীবনের ছবিই বেশি দেখা যায়। এ কথা কি সত্যি ?

রামকুমার : হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই।

অমর : ‘হাভাতে’ গল্পের টেলু ঠাকুর-ই কি ‘গাঁ-ঘরের কথা’য় টেলু চক্রবর্তী ? যে কিনা শিব দালানে রামায়ণ গাইত ?

রামকুমার : না। আমার গল্পে একটা টেলু চক্রবর্তী আছে এটা ঠিক কিন্তু গাঁ-ঘরের কথা'তে টেলু চক্রবর্তীর ছোঁওয়াও ওর মধ্যে আছে। মানে কোনোটাই আলাদা ব্যাপার না। কিছুটা লিখছি, কিছুটা দেখছি সেভাবেই চরিত্ররা এসেছে। যতটা আমি লিখেছি তার অনেকটাই কিন্তু চারপাশের দেখা থেকে। মানে আমার বানানো টুকু ফর্ম। আর দ্বিতীয় কথা একেবারে আমি দেড় বছর বয়সে আমার গ্রামে চলে যাই। যখন থেকে আমার বোধ তৈরি হ'ল তখন থেকেই আমি তাদের দেখছি। আর সেইসব চরিত্র নিয়েই আমার লেখা। আসলে বাজার থেকে যতসব জিনিসপত্র শাকসব্জি আমরা আনি সেটা তো সব রান্না করি না। রান্না করার সময় ফুলকপির ডাঁটা ফেলে দিই। বাঁধাকপির কোন অংশ ফেলে দিই, আলুর খোসা ফেলে দিই। সে রকম বাস্তবতাটা আছেই। তার কিছু অংশ ফেলে দিয়ে মসলা যোগ করে দিই। আবার কখনো আলু বাঁধাকপি মিলিয়ে মটরশুঁটি একটু দিয়ে লঙ্কা নুন যোগ করি। লেখাটাও তো আসলে বাজার করার মতোই ব্যাপার। সবটি দিচ্ছি না কিছুটা দিচ্ছি, একটু মিশেল করে লেখাটা দাঁড় করাচ্ছি।

অমর : তাহলে লেখাটা অনেকটা বানানোর মতো ?

রামকুমার : কিন্তু বানানো ব্যাপারটা ঐ রকম ঠিক নয়। একেবারে নিজেও কোথাও কোথাও ঢুকে আছি। কারণ আমিও তো ঐ গ্রামেরই বাসিন্দা। সেখানে কেউ আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, কখনো কাঁধে চেপে পাশের গ্রামে ফুটবল খেলা দেখতে গেছি। বায়না করেছি যাওয়ার জন্য। কেউ নিয়ে গেছে আমায়। এইসব চরিত্ররাই গল্পে উপস্থিত।

অমর : আপনার লেখার মধ্যে কি কল্পনা রয়েছে ? এই কল্পনার মিশেল কি শিল্প নির্মাণের কৌশল ?

রামকুমার : আসলে সবাই তো ছানা কেনে চিনি কেনে সন্দেশ বানায় কিন্তু যার কল্পনা যত ভালো, ইমাজিনেশন যার যত বেশি তার পাক তত ভালো হবে। যেমন কলকাতায় শ তিনেক ময়রা চিনি ময়দা প্রভৃতি মিশিয়ে সন্দেশ করছে। কিন্তু ভীম নাগ তো একজন। বা তার সঙ্গে আর একটা দোকান। তার মানে ভীম নাগের যে কারিগর সেই লোকটির কল্পনাটা অনেক বেশি। আবার পশ্চিমবঙ্গে হাজার দেড়েক দুয়েক লোক রসগোল্লা বানায় কিন্তু কে.সি. দাসেরটা অন্য রকম হয়ে যায় কেন ? আসলে যার যেমন কল্পনা। কাজেই কল্পনাকে মেশাতে পারে বলেই সন্দেশ, রসগোল্লা দু'একজনেরই ভালো হয়। কল্পনা ছাড়া রসগোল্লা বানানো যাবে কিন্তু কে.সি দাস হওয়া যাবে না। কাজেই লেখকের কল্পনা শক্তি অবশ্যই দরকার।

অমর : 'গোষ্ঠ' গল্পের লক্ষ্মণের জীবন কথা কতটা বাস্তব আপনার কাছে ?

রামকুমার : আমি তখন পুরুলিয়াতে আছি। ভেড়া হারিয়ে যায়, চিৎকার চেঁচামেচি হয়, ঝগড়া হয়। সেগুলো কানে ঢোকে। কখনো ভেড়া হারায়, কখনো ছাগল হারায়, গরু হারালেও রাখাল কাজ হারায়। আসলে বাস্তবে সবই কি হারায়, মানুষ তাকে হারিয়ে দেয়, হাটে বেচে দেয়।

সে জন্যে মানুষ গরু খুঁজে না পেলে গরুর হাটে যায়। সেখানেই সব শোনা। এই সব দেখতে দেখতে পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশনের যিনি আচার্য পল্লী তথা ঠাকুর তিনি নানা গল্প বলতেন। তেমনিভাবেই 'জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০, মানুষ কিংবা ঘুঘু' গল্পটি সে-ই আমাকে বলেছিল। বলেছিল এই জানো তো আমাদের গাঁয়ে সেই লোকটা মরতে গেছল। কালকে তাই আসতে পারলুম নি। সে কি হৈ হৈ, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সকাল থেকে। সন্ধ্যেবেলা দেখি লোকটা ঘুঘু নিয়ে ফিরছে। সারাদিন কি খোঁজাখুঁজি। মরতে গেছল ল্যাম্পপোষ্টে। ঘুঘুটা তারে আগে পড়ে গেছল বলে মরে গেল। সে ঘুঘুটা তুলে নিয়ে চলে এসেছে, আবার চাল মাগতে এল। এইটাই গল্পের সূত্র। ব্যাপারটা হচ্ছে ঘুড়ির দোকানে ঘুড়ি লাটাই দেবে কিন্তু ওড়াতে তো হবে। যে কিনছে ওড়ানোটা যা তার আয়ত্তে থাকতে হবে। যে যেমন মাঞ্জা দিতে পারবে সে তেমন ঘুড়ি কাটতে পারবে। যত ভালো সে খেলাবে, ঘুড়ি তত আকাশে জুড়ে বিচরণ করবে, উপরে উঠবো। সেটা তার (লেখকের) ব্যাপার। কাজেই গল্প লেখার গল্প এটাই।

অমর : আপনার বেশ কয়েকটা গল্পের কাহিনিতে চরিত্রেরা সমাজের হাজারো প্রতিকূলতায় হারিয়ে যায়নি। তারা নতুন জীবন ভাবনায় বেঁচে থেকেছে। এইসব (বলমালী, সুচাঁদ, লক্ষ্মণ) মানুষেরা প্রকৃতই কি নতুন জীবন পথে সুখী হবে ? আপনি কি বলবেন ?

রামকুমার : সত্যিই কি আমাদের তত সুইসাইড হয়! মানুষ কি তত সহজে আত্মহত্যা করে! 'গোষ্ঠ' গল্পের ছেলেটি (লক্ষ্মণ), ও কি খুব ভালো একটা জীবিকায় যাবে ? পরের বাড়িতে কাজ করলে সেখানে আবার ভেড়া হারালে ওকে আর একবার তো তাড়িয়ে দেবে। ওর বার বার ঘর বদলেই হয়তো ওকে যেতে হবে। নতুন বাড়িতে কাজ পেয়ে একটু বেশি মাইনে চাইলে ওকে তাড়িয়ে দেবে। এদের ঘর থেকে ঘরেই যেতে হয়। ভাগ্য বদলায় না। আসলে মধ্যবিত্ত বাঙালি আমরা যারা গল্প লিখি আমরা যত সহজে হতাশ হয়ে যাই , আমাদের আকাঙ্ক্ষাটা এত বড়ো যে কিছু না পেলেই মনে হয় আমার সব শেষ হয়ে গেল। ওদের পাওয়াটাও কম, আকাঙ্ক্ষাটাও কম, কিন্তু বাঁচার ক্ষেত্রে যেটা শক্তি বলি সেটা আমাদের মতোই। ওরা ছোট জিনিস নিয়েই আনন্দ করতে পারে। 'সুচাঁদ' মরতে গিয়ে জোড়া ঘুঘু পেয়েছে। ফিরে এসে মাংস ভাত খেয়ে চাঁদের আলোয় বউ-এর সাথে গান গেয়ে ফূর্তি করেছে। আমি গ্রামের দিকেও দেখি, হয়তো আমার দু'একটা লেখার মধ্যেও এসে গেছে, অতি সাধারণ গরীব মানুষ। কিন্তু সে তখন কীর্তন গায়, সে খেয়েছে হয়তো সারাদিনে একটু আলু সেদ্ধ একটু ভাত, ডাল হয়তো পেলেও পেতে পারে একটু। সে সামান্যই খেয়েছে। কিন্তু সে যখন কীর্তন গায় তখন তার যে বিরল প্রতিভা, তার আর্তির মধ্যে কোনো শূন্যতা থাকে না। একেবারে পরিপূর্ণ। তা না হলে পুরুলিয়ার মতো না খেতে পাওয়া মানুষগুলো ঝুমুর গান গায় কি করে ? এরা নাচেও দেখেছি। আমি শুধু ভেবেছি এরা যমুনার যে ঢেউ ভেঙে পড়ছে পুরুলিয়ায়— এত জল পেল কোথা থেকে ? যেখানে

ডাঙা, শুকনো এলাকা। ওটাই তো কল্পনা, এরা বিভোর হয়ে থাকে। বড় শিল্পী এরা। পুরুলিয়াতে এরা (শিল্পীরা) রাধা-কৃষ্ণকে টেনে আনতে পারে। এদের বুকের ভেতরেই একটা যমুনা নদী বানিয়ে ফেলতে পারে। বাইরে নেই তো কি হয়েছে! ঐ যে রবীন্দ্রনাথের গানে আছে না যখন চোখের আলো নিভে গেছে তখন অন্তরের আলোতে সে দেখে। চোখের আলো চলে গেলে মানুষ যেমন অন্তরের আলো জ্বালায় ঠিক সেইরকমই মানুষের মনেরও একটা চোখ থাকে, মনেরও একটা ক্ষেত্র থাকে। যেটাকে আমরা বলতে পারি উদ্বেল। এই উদ্বেল মানে হচ্ছে বেলাভূমি। আসলে শব্দের উৎস এখান থেকেই— যেখানে সমুদ্রের জলটা এসে বেলাভূমি পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। মানে হৃদয়ে স্পর্শ করছে। যখন এরা রামায়ণ গান গায়, যখন কীর্তন গায় তখন ঐ উদ্বেল অর্থাৎ ঐ আবেশটা একটা বেলাভূমি ছুঁয়ে ছড়িয়ে যায়। আবার সে হয়তো পরের দিন আবার একটা জীবনে প্রবেশ করে। এটা নিশ্চয়ই তার সৃষ্ট জগতের জীবন নয়। কিন্তু কিছু তো থেকে যায়। ঐ দুটো থাকে বলেই মাঝে কষ্ট দুঃখ থাকে বলেই বেঁচে থাকে। মাঝে একটা আনন্দের ধারা থাকে বলেই জীবন এগিয়ে চলে। সত্যি কথাই ভেতরে মাখনের একটা পাতলা আস্তরণ থাকে বলেই পাঁউরুটিটা খেতে ভালো লাগে। শুধু পাঁউরুটিটা খাওয়া যেত না। কাজেই জীবনের ঐটুকু রস রয়েছে বলেই জীবন আনন্দের হয়। এই যেমন আমিও গ্রামে থেকে দেখেছি অনেক কিছুই বড় হয়েছে। বাছুরটাও বড় হচ্ছে, আমি বাড়ছি। তাহলে আনন্দ কোথায় ? দেখছি সজনে ফুল ধরেছে, ডাঁটা বড় হল, চারপাশটা ক্রমশ প্রকৃতির রূপে সেজে উঠছে, ভালো লাগছে। বর্ষা হল, কাজেই সামনে শুকনো পুকুরটা জলে ভরে উঠল ভাবছি সাঁতার কাটব। তারমানে আনন্দটাতো নানা পথ দিয়েই আসছে। আনন্দটা শুধু টাকাপয়সা দিয়ে তো আসে না। রবীন্দ্রনাথ রাজপ্রাসাদ (জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি) ছেড়ে বোলপুরে গিয়ে কয়েকটি ছাত্র নিয়ে পড়াতে শুরু করলেন। যেখানে বনজঙ্গল, ম্যালেরিয়া-মশার উপদ্রব। অর্থের তো অভাব ছিল না। সুতরাং আনন্দটা অন্য জিনিস।

অমর : স্বার্থ, অর্থের বিপরীতে জীবনের আলাদা একটা স্বাদ রয়েছে। যেটা সকলে উপভোগ তথা গ্রহণ করতে পারে না, দেখতে পায় না। অনুভূতিপ্রবণ মানুষরাই পারেন। যেটা আপনিও পেয়েছেন সেই আনন্দের স্বাদ। এটা তো সত্যি ?

রামকুমার : একদিন রামকৃষ্ণ উত্তর কলকাতার বাগবাজারের দিকে এসেছেন। সন্ধ্যের দিকে ফিরছেন গাড়িতে চড়ে। পথে একদল লোক মদ খেয়ে উদ্দাম নৃত্য করছে, মাতলামি করছে। ঐ অঞ্চলে তখন প্রচুর লোক মদ খেয়ে মাতাল হত। ড্রেনে পড়ে থাকত। ড্রেনের জল আটকে যেত। নালা পরিষ্কারের সময় চেঁচামেচি হত। তো পথে মাতালদের নৃত্য দেখে রামকৃষ্ণের নাচতে ইচ্ছে হ'ল। এখানে মদ খেয়েছে মাতাল হয়েছে অন্য পরিবেশ কিন্তু তার আনন্দটা তো প্রকৃতই আনন্দ। সেটা তো সত্যিই পবিত্র ব্যাপার, যেখানে কোনো কলুষতা নেই। আর এই সব পারিপার্শ্বিক আনন্দগুলোই ঘুরে ফিরে আমার গল্পের মধ্যে জায়গা পেয়েছে।

চারপাশ দেখতে দেখতে আনন্দ খুঁজে পেয়েছি, আর তার সাথে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন ছিল। তার মধ্যেও কোথাও একটা আনন্দ কিভাবে ফুটে উঠত সেটা আমি জানি না। হয়তো চাহিদাও কম ছিল, সবটা মিলেই। কাজেই আপনি যেটা বলছেন বাঁচার ব্যাপারটা; এইটাকেই আমি যেভাবে ধরেছি তা আসলে খুঁজে নিয়েছি। আমাদের মতো করে। আসলে এই বাঁচা নির্দিষ্ট রোজগার করে বাঁচা নয়। বাঁচার আনন্দে বাঁচা। হেরে না যাওয়া। তা যে সরকারি খতিয়ানে ভালোভাবে বাঁচা তা কিন্তু নয়। তা একেবারে ব্যক্তিগত।

অমর : আসলে কেউ কেউ নেশায় ছুটছে, অদ্ভুত ধরনের নেশা। ঠিক কতটা হলে তার ইচ্ছেপূরণ হবে সেও জানে না এবং সেখানে এক ধরনের এক শ্রেণির মানুষ রয়েছে। আবার অনেকে সারাজীবন দিয়েও জানতেই পারল না যে ঠিক কি কি অভাব পূরণ হলে শান্তিতে থাকা যায়— এই ভাবনা চিন্তাটা তো সবার মধ্যে ঘটে না। আপনি কি বলবেন ?

রামকুমার : হ্যাঁ ঠিকই। তার মনই হয়তো অতি সহজভাবেই তাকে ঐ আনন্দের দিকে নিয়ে যায়। সে যে সঠিক বিবেচনা বুদ্ধি দিয়ে করছে তাও নয়। তার মন তাকে নিয়ে যাচ্ছে আর ভাবছে আমার এতেও পূরণ হয়নি। একটি মেয়ে বারবার স্বামীকে ছেড়ে দিচ্ছে। কারণ তার স্বামী তার মনকে বুঝছে না। আমার কাছে ঐ মেয়েটার যাওয়াটা সত্য। মানে সতী সাবিত্রী হয়ে যার সাথে থাকব মেনে চলব সহ্য করব। আমার কোনো জীবনের চাহিদা নেই— এই সত্যের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু ওর চাহিদা কেবল জামাকাপড় ঘরসংসার নয়। ওর চাহিদা ছিল মনের। অন্য কিছু খুঁজে ছিল, একটা মুক্তি। যার মূল্য অবশ্যই রয়েছে অন্তত ওর কাছে। কাজেই যা দেখছি সে দেখাটাতো কিছুটা আমার দেখা। সেই অর্থে কিন্তু একেবারেই Objective Reality বলে আমার লেখার মধ্যে চলে। Reality কোথাও একটা আছে আবার আমার লেখায় তার একটা Subjective বা ব্যক্তিগত চোখ থেকে একটা কিছু ধরতে চেয়েছি।

অমর : ভাষাশৈলীর মধ্যে দেখতে পাই 'আমাদের গ্রাম' গল্পের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু শব্দ। যেগুলির বানান সহ ব্যবহারের সচেতনতা বোধ তৈরি হয়েছে। যেমন— মুতলে (পেচ্ছাব বানানটা গোলমেলে), ব্যাবহার (য-ফলার পর আকার হবে ? দেওয়া ভালো। ফাঁকা লাগছে), সশানের (আবার ঝামেলার বানান)।— এর কারণ কি কেবল রসিকতা না অন্য কিছুর উদ্দেশ্যে ব্যবহার ?

রামকুমার : আসলে 'আমাদের গ্রামে'র যে লেখক দেখবেন সে সদ্য সাক্ষরতা অর্জন করেছে। তারফলে কিন্তু সে খুব পরিণত নয়, বয়সও তত নয়। গ্রামের যে ছবি যেগুলো রচনা বইয়ে পড়তাম সেখানে পুকুরের জল ঢলঢল করে, শ্যামল শস্যক্ষেত্র, কবির কথায় বুকভরা মধু বাংলার বধূ— ক্লাস সিক্স, সেভেনে সেটা ঠিক আছে। কিন্তু আসল গ্রাম দেখা শুরু হয় একজন পূর্ণ বয়স্কের চোখে, সে যখন সাক্ষর হয়েছে। সে যখন আমাদের গ্রাম লেখে তখন তো সে

মুখস্থ করে লেখেনি। এবং এতদিনের জীবনে পুরো গ্রাম দেখা হয়ে গেছে। সে জানে গ্রামের কতগুলি লোক ভালো আর কতগুলি লোক পিলে খচ্চড়। সে সবাইকে দেখেছে। ক্লাস সিক্স, সেভেনের রচনা বইয়ের গ্রামের থেকে আমাদের গ্রামটা অনেক আলাদা।

অমর : এই গ্রামটা আপনার নিজের গ্রামের ভাবনা, বাঁকুড়া জেলার গ্রাম ?

রামকুমার : এইগুলো জুড়ে জুড়ে বর্ণনা। একটার সাথে একটা।

অমর : গল্পের শেষে তো আপনার নামেই চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে। তাহলে গল্পের লেখক ও গ্রামের ব্যক্তি রামকুমার কি মিলে মিশে এক হয়ে গেছে ?

রামকুমার : মানে কোথাও একটা সম্পর্ক যেন জড়িয়ে রয়েছে। আমার সাথে চরিত্রেরা তাদের ব্যক্তি জীবনের কথা, সৃজন, চারপাশের গোটা পনেরো গ্রাম অঞ্চলের মডেলটা চলে আসে। মানে এককালে আমি যখন ছিলাম তারা ছিল 'দুখে কেওড়া' উপন্যাসের 'দুখে কেওড়া' নামে একজন ছিল। তার ছেলে ফটিক এদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলে মনে হয় আমার লেখাতে এরা সাহায্যও করেছে। আমি তো গ্রামের স্কুলে পড়েছি, তখন স্কুলে খালি পায়ে যেতে হত। সেই সময় গ্রামের স্কুলে আসন নিয়ে যেতে হত। বসবার জন্য, তালপাতার চেটাই। আর ক্লাস ফোরে বেঞ্চে বসতে পেতাম। এই ক্লাসেই হেডমাস্টার মহাশয় পড়াতেন। সবাই বড় মাস্টার বলত। প্রভাকর মাস্টার হেডস্যার। আমি সেই সব পেয়েছি, দেখেছি। এখনকার মতো তখন ইংরেজি মিডিয়ামের দাপট হয়নি। কেউ কেউ ক্লাস থ্রি-ফোর পড়ে ছেড়ে দিচ্ছে। তখন জলসেচের তেমন ব্যবস্থা ছিল না। এখন তো স্যালো ইত্যাদি হয়েছে। জলের ব্যবস্থার জন্য ধান তো এখন ভালোই ফলে। তখন সরকারের সাথে মানুষের তেমন যোগাযোগ ছিল না। যারা তখন পড়ে ছেড়ে দিয়েছে তাদের সাথে এখনও দেখা হয় কথা হয়। তেমনি একজন শঙ্কর। গ্রামে গেলে বসায়, খাওয়ায়। সে আগে চা দোকান করেছিল এখন মিষ্টির দোকান করেছে। তারপর সুখেন ছিল। সে এখনও জামাকাপড় ইস্ত্রি করে। সুখেন আমার সহপাঠী। তাছাড়া অসীমের কথা আছে। ফটিক আমার সঙ্গে পড়ত। শম্ভু ছিল। ফটিক পরে ডাকাত হয়ে যায়। তার অভাব ছিল। তাই সে ডাকাতি করতে বাধ্য হয়েছে। তার অভাব না থাকলে সে তো দারোগা হতে পারত। আমারই কয়েকজন বন্ধু তাকে ধরিয়ে দিয়েছে। অথচ ফটিকই ডাকাতদের পেটাতে পারত। আসলে একজন পুলিশ যেভাবে ডাকাতকে দেখে একজন লেখক তো সেভাবে দেখে না। দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ তো থাকবেই।

অমর : রাঢ় অঞ্চলের অভাবী মানুষ যারা, যারা চলমান সমাজের প্রকৃত আলোয় আসতে পারছে না, তাদের জন্য আপনার দায়বদ্ধতা কতটা ? কিভাবে তারা সমাজের মূল স্রোতে আসবে বলে আপনার মনে হয় ?

রামকুমার : আসলে ওদের জীবনে পরিবর্তন এসেছে। আমাদের সময়ে দেখেছি চাষীদের কিছু জমি

ছিল যেগুলোর মধ্যে দু'বার চাষ হত এমন জমি কিছু এবং মাঠের কিছু জমিতে একবার চাষ হত। আর এখন সেখানে তিনবার করে চাষ। আমাদের আগে পাকাবাড়িই ছিল না, এখন সেখানে পাকাবাড়ির সংখ্যা প্রায় ৬০ শতাংশ। আর যার পাকাবাড়ি নেই অন্তত সে এ্যাসবেস্টর দিয়েছে। আর এখন খড়ের চাল খুবই কম। বদলেছে তো অবশ্যই। চাষবাস ভালো হচ্ছে। জলের ব্যবস্থা ভালো হচ্ছে। কিছুটা ক্যানেল সিস্টেমের ফলে চাষের তো সুবিধে হয়েছে। জলের স্তর নামার ফলে সমস্যা তো রয়েছেই। শিক্ষার হার বেড়েছে, কেউ কেউ ছোটখাটো ব্যবসা করছে। গ্রামের হাটে কেউ কেউ ঘুগনি, ডিমসেদ্ধ বিক্রয় করছে। জলের অভাবে একসময় বেগুনগুলো রোগা রোগা ছিল, ডাটা সার। গরমকালে সব্জি হত না। এখন গরম কালেও সব্জি হচ্ছে। সরকারি টাকায় পুকুরগুলো কাটানো হচ্ছে বলে জল গভীর হচ্ছে। মাছ পাওয়া যাচ্ছে। মানুষ কাজের খোঁজ পেয়েছে। একশ দিনের কাজটা কিন্তু কাজে এসেছে। মানুষ কিছু করে খাচ্ছে। কাজেই সেই সময়টাও বদলেছে।

অমর : এখন তো দেখছি সরকার থেকে গরীব মানুষদের বাড়ি বানিয়ে দিচ্ছে।

রামকুমার : হ্যাঁ। এতে তো সুবিধে হচ্ছেই। আসলে এই সব মিলেই পরিবর্তন তো হয়েছেই। হচ্ছেও। এখন বাড়িঘর দেখলে বোঝা যায়। মানুষজনের চেহারা দেখলে বোঝা যায়। এটা খুব আনন্দের কথা। আগে ছেলে মেয়েদের প্রাইমারী স্কুলেই পাঠাতে চাইত না, এখন বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেয়। আমাদের সব ডাকতে যেত বাড়ি থেকে। পড়াশুনার পরিবেশ রয়েছে। একাধিক বার ধান, আলু চাষ হলে যা হয়।

অমর : আপনার মতে বাংলা সাহিত্যের কোন শাখায় চর্চার পরিমাণটা বর্তমানে বেশি হচ্ছে বলে মনে হয় ?

রামকুমার : সবচেয়ে বেশি লোক বাংলাভাষায় কবিতা লেখে। কবির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কবিতার পরে যদি বলেন তাহলে গল্প বেশি লেখা হয়। তুলনায় উপন্যাসটা কম লেখা হয়। গল্পটা তার চেয়েও বেশি লেখা হয়। আর নাটক তেমন লেখা হয় না। আসলে ওটার সাথে মঞ্চে যাদের যোগ বেশি সেই সব মানুষরাই লেখেন, ওটা তো একটা বিশেষ ফর্ম। তবে শুধু এগুলো বললে চলবে না। যাত্রাটাকেও কিন্তু ধরতে হবে। আমরা যেন এতটা না আরবান হয়ে যাই। যাত্রাও একটা সময় আমরা দেখেছি। শম্ভুবাবু, ব্রজেন দে, খুবই জনপ্রিয়। ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় তো ছিলেনই। তারাশঙ্করের 'কবি' ছাড়াও অনেক উপন্যাস যাত্রায় পরিচিতি পেয়েছে। তবে আমার মনে হয় প্রথমে কবিতা, তারপর ছোটগল্প, তারপর উপন্যাস, তারপর নাটক। তবে সত্যি কথা, আমার খুব বেশি নাটক পড়া হয় না, এখন তাহলেও হয়। আসলে নাটক ঠিক পড়া না হলেও দেখি। আর সেটা তো মঞ্চায়নটা। আমি তো আর টেক্সটটা দেখছি না। তবে এখন ব্রাত্য বসুর নাটক দেখেছি। মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বাদল সরকারের নাটক পড়েছি। আর মনোজ মিত্রের নাটক পড়েছি, দেখেওছি। নাটক এইসময়

আর তেমন দেখছি না। তখন একসময় বেশ পড়েছি। আর রবীন্দ্রনাথের নাটক তো পড়েইছি, সে তো আলাদা ব্যাপার। মন্মথ রায়ের নাটক পড়েছি।

অমর : আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আমাকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। নমস্কার।

রামকুমার : নমস্কার।।

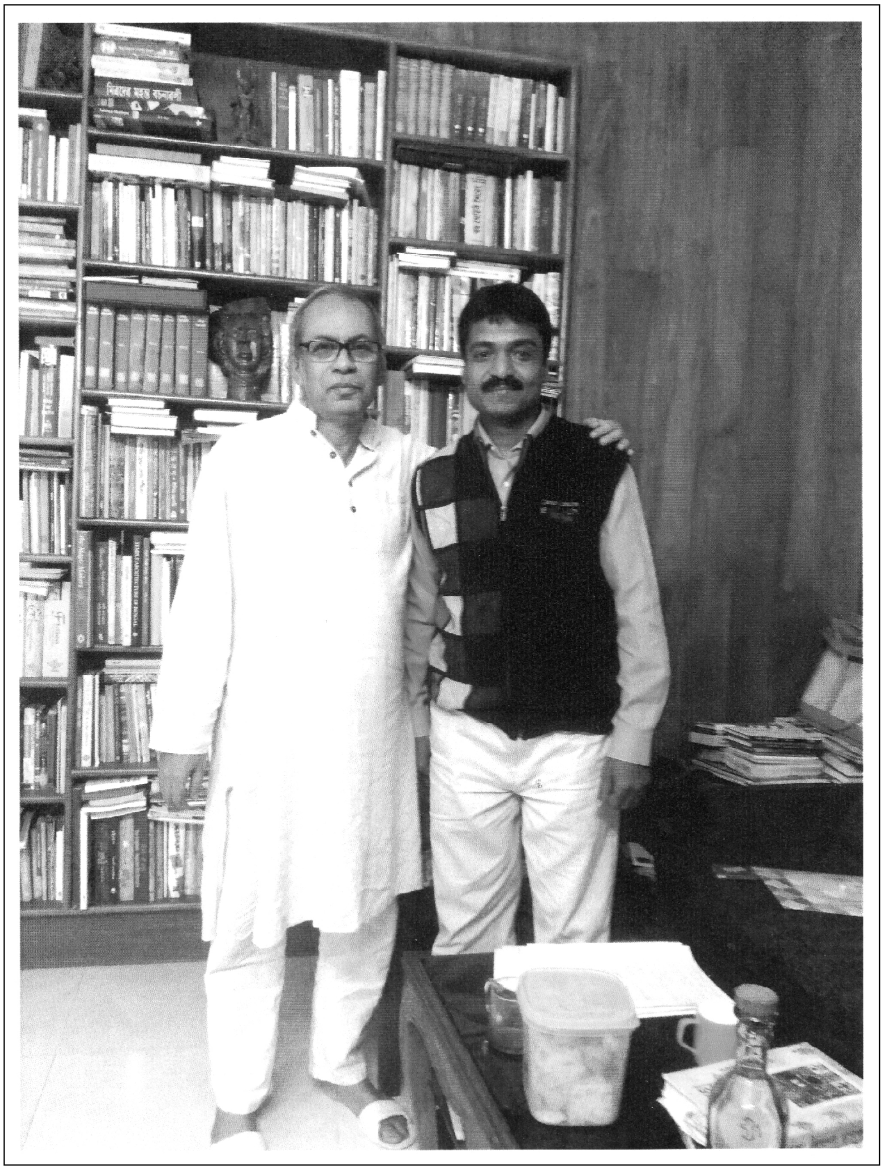

গল্পকার রামকুমার মুখোপাধ্যায় ও গবেষক অমর আদিকারী

তারিখ : ০৭.১২.২০১৮

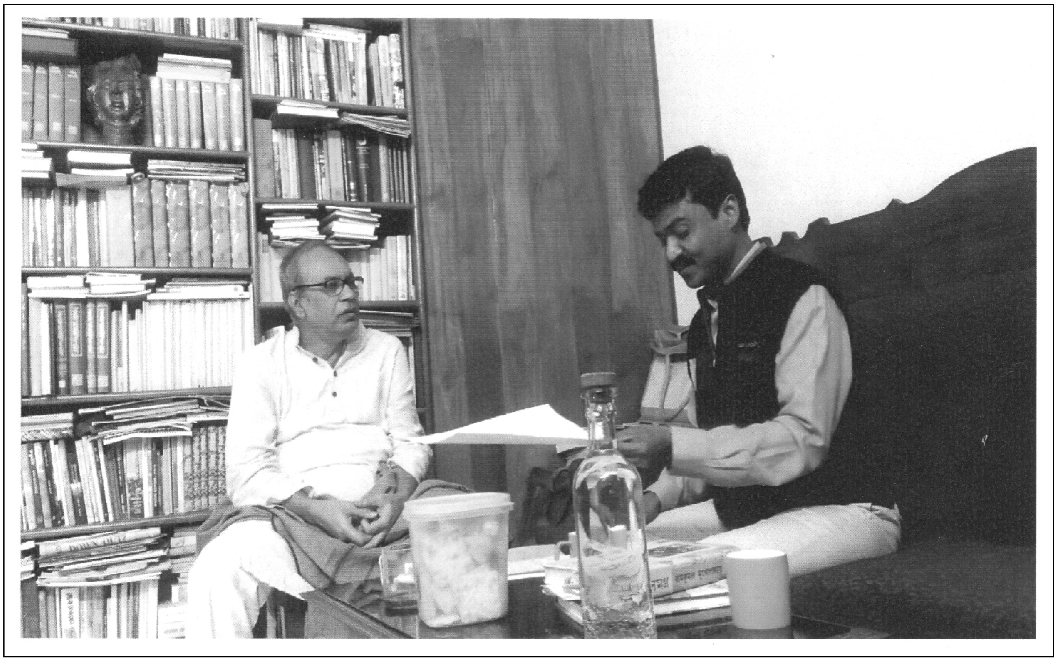

সাক্ষাৎকার গ্রহণের বিশেষ মুহূর্ত

গল্পকার রামকুমার মুখোপাধ্যায় ও গবেষক অমর আদিকারী

স্থান : স্কাইলাইন এ্যাপার্টমেন্ট, পর্ণশ্রী, বেহালা, কলকাতা

তারিখ : ০৭.১২.২০১৮